২০১৬ সালের মানবপাচার প্রতিবেদন
বাংলাদেশের দেশভিত্তিক বর্ণনা

বাংলাদেশ – ধাপ ২

জবরদস্তিমূলক শ্রম ও যৌনশোষণে বাধ্যকরার নিমিত্ত পুরুষ, নারী, ও শিশুদের পাচারে বাংলাদেশ মূলতঃ একটি উৎসদেশ, এবং কিছুটা ক্ষুদ্রতর ব্যাপ্তিতে পারাপারের স্থল ও গন্তব্যদেশ। মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, ইওরোপ, ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করে আসা বাংলাদেশী নারী-পুরুষদের মধ্যেও অনেকে এমনসব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে থাকে যা জবরদস্তিমূলক শ্রমদানে বাধ্যকরার ইঙ্গিতবাহী। দেশত্যাগের পূর্বে অনেক দেশত্যাগী কর্মীকে তাদের নিয়োগ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ এসোসিয়েশান অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ (বায়রা) অধিভুক্ত রিক্রুটিং এজেন্সীসমূহকে আইনতঃভাবে তাদের দ্বারা নির্ধারিত উচ্চমাত্রার মাশুল ও লাইসেন্সবিহীন সাব-এজেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত বেআইনি মাশুল পরিশোধ করতে ধারকর্জ করতে হয়; এরফলে বিদেশগামী কর্মী একধরণের ঋণদাসত্বে নিপতিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে যায়। কিছু কিছু রিক্রুটিং এজেন্সী ও এজেন্ট লোক রিক্রুট করার কাজে জালিয়াতি করে থাকে। এরমধ্যে চুক্তির হেরফের করাও অন্তর্ভুক্ত যাতে তারা এক ধরণের চাকরি ও শর্তের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু পরে বিদেশে আসলে চাকরি, নিয়োগকর্তা, শর্তাদি, বা বেতনহার বদলে ফেলে। বাংলাদেশ ৩২,০০০ নিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীর আশ্রয়দাতা দেশ, এরবাইরে বৈধ কাগজপত্রবিহীন আরো ৫০০,০০০ জনের মত রোহিঙ্গা আছে যাদের রাষ্ট্রহীন অবস্থা মানবপাচারের শিকার হয়ে পড়ার আশংকাকে বাড়িয়ে তোলে। রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী বিদেশগামীদের মধ্যে যারা নৌকায় চড়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে পাড়ি জমায় তারা অনাহার, মারধর, গুম, এবং পণদাবীর শিকারে পরিণত হয়; যারা পরিশোধ করতে পারেনা তাদের জবরদস্তিমূলক শ্রমের জন্য মূলতঃ মাছধরার নৌকায় বিক্রী করে দেয়া হয়। বিশেষতঃ মহিলা ও বালিকা যারা গৃহস্থালী কাজের জন্য দেশত্যাগ করে তারা নিপীড়িত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে সবচেয়ে বেশী। কিছু কিছু মহিলা যারা বাংলাদেশী রিক্রুটমেন্ট এজেন্সীর মাধ্যমে গৃহস্থালী কাজের জন্য দেশত্যাগ করে লেবানন বা জর্ডানে যায়, তাদেরকে পরবর্তীতে সিরিয়ায় চালান করে দেয়া হয় এবং জবরদস্তিমূলক শ্রমের জন্য বাধ্য করা হয় বা যৌনকর্মী হিসাবে পাচার করে দেয়া হয়। কিছু কিছু নারী ও শিশুকে ভারত ও পাকিস্তানে যৌনকর্মী হিসাবে বা জবরদস্তিমূলক শ্রমের জন্য পাচার করা হয়। দেশের অভ্যন্তরে বাচ্চাদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের যৌনকর্মী হিসাবে পাচার, গার্হস্থ্য দাসত্ব এবং জবরদস্তিমূলক ও দাসশ্রমিক হতে বাধ্য করা হয়, যেখানে চাকুরীর শর্তের অংশহিসাবে পাচারকারীর কাছে কর্মীর দেনার দায়কে পাচারকারী অপব্যবহার করে। পথশিশুদের মাঝেমধ্যে ভয়ভীতি দেখিয়ে অপরাধমূলক কাজে বা ভিক্ষাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়; ভিক্ষাবৃত্তির নাটগুরুরা তাদের উপার্জন বাড়ানোর জন্য কখনো কখনো শিশুদের পঙ্গু করে দেয়। কোন কোন ঘটনায় মা-বাবারা তাদের শিশুদের একপ্রকারের দাসত্বচুক্তিতে বিক্রি করে দেয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে জালিয়াতি ও শারীরিক ভয়ভীতি দেখিয়ে শ্রমসাধ্য কাজে তাদের বাধ্য করা হয়, যারমধ্যে রয়েছে দেশীয় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বা যৌনকর্মী হিসাবে পাচার। ঋণদাসত্ব বিষয়ক একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের মতে, বাংলাদেশী পরিবার ও কিছু ভারতীয় অভিবাসী শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশী ইটভাটায় দাসমজুর হিসাবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়; এইসকল ইটভাটার কিছু মালিক

পারিবারিক ঋণ আদায়ের অভিপ্রায়ে মহিলাদাসীদের যৌনকর্মী হিসাবে বিক্রী করে দেয়, আর কিছু কিছু বাংলাদেশী পরিবারকে চিংড়িচাষে ঋণদাসত্বে বাধ্য করা হয়। কিছু কিছু ভারতীয় জাতিগত পরিবারকে দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে চা-শিল্পে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এনজিওরা দাবী করে যে, কিছু কিছু পদাধিকারীরা পতিতালয়ে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পারাপারের স্থলে, এবং সমূদ্রগামী জলযানের আরোহনস্থলে মানবপাচারকারীদেরকে তাদের কর্মকান্ড চালানোর সুযোগ প্রদান করে থাকে।

মানবপাচার নির্মূল করার ন্যূনতম যে মানদন্ড তা বাংলাদেশ সরকার পূরণ করেনা; তবে সেটা করার জন্য তারা উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সরকার পাচার সংক্রান্ত তদন্ত বৃদ্ধি করেছে-২০১৪ সালে যেখানে ১২টি ঘটনার তদন্ত হয়েছে সেখানে ২০১৫ সালে ২৬৫টি ঘটনার তদন্ত করার মাধ্যমে মানব পাচারের তদন্তকাজ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মামলা দায়েরের সংখ্যাও বেড়েছে, সরকার ২০১৫-২০১৭ সালের জন্য তার কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে, এবং মানবপাচারের ভুক্তভোগীরা যাতে আশ্রয় নিতে পারে তেমন নয়টি বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র, প্রবেশকেন্দ্র, ও নিরাপদ আশ্রমের জন্য অর্থ জোগান দেয়া অব্যাহত রেখেছে। তবে, পরপর তিনবছর ধরে সরকার মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২-এর জন্য প্রায়োগিক বিধিমালা প্রণয়ন কাজ চূড়ান্ত করতে পারেনি। ফলে মানবপাচারের ভুক্তভোগীদের সনাক্তকরণ, উদ্ধার ও পূনর্বাসনের কাজ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সংখ্যা কমেছে, আর মানবপাচারে কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তার যোগসাজোস বড় ধরণের সমস্যা থেকে গেলেও ২০১৫ সালে মানবপাচারে সম্পৃক্ত কোন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোন তদন্ত, মামলা দায়ের বা সাজা দেয়ার কোন বিবরণ সরকারের তরফ হতে পাওয়া যায়নি। সরকার ২০১৫ সালে মানবপাচারের ভুক্তভোগীদের সণাক্তকরণের যে সংখ্যা প্রদান করেছে তা উল্লেখযোগ্যভাবে কম এবং প্রতিবেদনকালে ভুক্তভোগীদের সুশ্রুষা প্রদানের নিমিত্ত প্রেরণ করার বিষয়ে সরকারি প্রয়াসের চিত্র অজ্ঞাত থেকে গেছে। মানবপাচারের ভুক্তভোগীদের আশ্রয়মূলক সেবার নিমিত্ত প্রেরণের কোন সরকারি বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই। বেসরকারি রিক্রুটমেন্ট এজেন্সীসমূহের চড়া মাশুল এবং কখনো কখনো অসাধু কর্মকান্ডের প্রভাব লাঘব করার জন্য সরকার মালয়েশিয়ার সাথে শ্রমিক রপ্তানীর চুক্তি নবায়ন করলেও চুক্তিটি এখনো এই প্রতিবেদনকালের শেষসময় অবধি বাস্তবায়ন করা হয়নি, আর চুক্তির বাইরের বিদেশগমনেচ্ছু শ্রমিকদের নিকট থেকে কোন কোন শ্রমিক রিক্রুটারদের অত্যধিক রিক্রুটমেন্ট ফিস আদায় ও প্রতারণামূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে সরকার তেমন কিছুই করেনি।

বাংলাদেশের জন্য সুপারিশসমূহ:

মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ এর প্রায়োগিক বিধিমালা প্রণয়ন চূড়ান্তকরা, অধিষ্ঠান করা, এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা; কর্মীদের উপর আরোপিত লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটকারিদের সকল প্রকার ফিস আদায় নির্মূল করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করা; বিধিসম্মত আইনী প্রক্রিয়ার প্রতি যথাসম্মান প্রদর্শনপূর্বক, বিশেষতঃ শ্রমিক পাচার সম্পর্কিত, মামলা দায়ের করা ও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সংখ্যা বাড়ানো; ভুক্তভোগীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিসেবার সংস্থান করার নিমিত্ত ন্যূনতম মাননির্দেশিকা ও ভুক্তভোগীদের উক্তরূপ পরিসেবাসমূহের নিকট প্রেরণের জন্য কর্মপরিচালনার প্রমিত বিধিবিধানসমূহ অধিষ্ঠান করা; মানবপাচারে সরকারি যোগসাজোসের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা এবং যোগসাজোসকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা; আইন প্রয়োগকারী, শ্রম পরিদর্শক, এবং অভিবাসন কর্মকর্তাসহ সরকারি

কর্মকর্তাদের মানবপাচার সম্পর্কিত ঘটনা চিহ্নিত করার ও ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা পরিসেবার আওতায় প্রেরণের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রদত্ত প্রশিক্ষনকে উন্নততর করা; বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসসমূহে ভুক্তভোগীদের জন্য লভ্য সহায়তামূলক পরিসেবার সম্প্রসারণ করা; প্রতারক শ্রম রিক্রুটারদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনায় মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ এর আশ্রয় নেওয়া; শ্রম অধিকার, শ্রম আইন, এবং গন্তব্যদেশে ও বাংলাদেশে ন্যায়বিচার ও সহায়তা প্রাপ্তির পদ্ধতির উপর অধিবেশনসহ অভিবাসী কর্মীদের জন্য দেশত্যাগপূর্ব প্রশিক্ষণের মান উন্নত করা; এবং জাতিসংঘের টিআইপি প্রোটোকল ২০০০ (প্রটোকল টু প্রিভেন্ট, সাপ্রেস এন্ড পানিশ ট্রাফিকিং ইন পার্সন্স) স্বাক্ষর করা।

মামলা পরিচালনা

সরকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে মিশ্র প্রচেষ্টার চিত্র প্রদর্শন করেছে-তদন্ত এবং মামলা বেড়েছে; তবে, দোষী সাব্যস্ত হওয়ার নজির কমেছে, আর পরপর তিনবছর ধরে সরকার মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ এর জন্য প্রায়োগিক বিধিমালা প্রণয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেও তা চূড়ান্ত করতে পারেনি। মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২-তে সকলপ্রকার মানবপাচারকে নিষিদ্ধ ও দন্ডযোগ্য করা হয়েছে, যদিও এতে বিদেশগমনেচ্ছু শ্রমিকদের জালিয়াতমূলক নিয়োগপ্রদানকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র সে সকল ক্ষেত্রে, যেখানে রিক্রুটার অবহিত থাকে যে নিযুক্ত শ্রমিককে বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হতে হবে। শ্রমিক পাচারের অপরাধের জন্য বিধিনকৃত দন্ড হচ্ছে পাঁচ থেকে বারো বছরের কারাদন্ড এবং কমপক্ষে ৫০,০০০টাকা জরিমানা (মাঃডঃ ৬৩৩), আর যৌনকর্মী পাচারের জন্য বিধানকৃত দন্ডের ব্যাপ্তি হচ্ছে পাঁচবছরের কারাদন্ড থেকে মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত। এই দন্ডসমূহ যথেষ্ট কঠোর এবং এগুলো অপরাপর গুরুতর প্রকৃতির অপরাধ, যেমন ধর্ষণ, এরজন্য বিধানকৃত দন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০১৫ সালে সরকার ১৮১টি যৌন এবং ২৬৫টি শ্রমিক পাচারের ঘটনার তদন্ত করেছে, যা ২০১৪ সালের ১৪৬টি যৌন এবং ১২টি শ্রমিক পাচারের মামলার চেয়ে বেশী। জবরদস্তিমূলক শ্রমের মামলার মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে দাসত্বচুক্তির ৯৮টি মামলা তদন্ত করা হয়েছে। মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২-এর আওতায় কর্তৃপক্ষ ২০১৫ সালে ৪৮১ জন কথিত পাচারকারীর বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করেছে, ২০১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪৪৯ জন। সরকার ২০১৫ সালে চারজন পাচারকারীকে দোষী সাব্যস্ত করে, ২০১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৫ জন। দোষীসাব্যস্ত পাচারকারীদের মধ্যে আদালত তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং একজনকে দশবছরের কারাদন্ড প্রদান করেছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে সরকার ৯৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ১০,৮৯০ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে মানবপাচার বিরোধী প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা মানবপাচার ও অপরাপর অপরাধ বিষয়ক ৮১জন তদন্তকারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে; এই প্রশিক্ষণসমূহের জন্য পুলিশের মানব পাচার বিরোধি ইউনিট থেকে বস্তুগত সহায়তা দেয়া হয়। কিছু কিছু এনজিও জানিয়েছে যে, মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনটি জেলা ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের কাছে ব্যাপকভাবে বিলি করা হয়নি।

মানবপাচারের অপরাধমূলক ঘটনায় কিছু কিছু সরকারি কর্মকর্তার যোগসাজোস একটি বড় সমস্যা থেকে গেছে। চোরাচালান, চাঁদাবাজি, এবং সম্ভবতঃ আন্দামান সাগর দিয়ে বিদেশগমন সংকটের সাথে সংশ্লিষ্ট মানবপাচারের সাথে চট্টগ্রাম বিভাগের একজন সংসদ সদস্যের কথিত বিজড়নের বিবরণ সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের উভয় দিকেই

রাজনীতিবিদ, পুলিশ, এবং সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীসমূহ পাচারকারীদের গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য একটি টোকেন প্রথা ব্যবহার করে বলে অভিযোগ আছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, পুলিশ ও সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীসমূহ পতিতালয়ে ও সমূদ্রগামী জলযানের আরোহনস্থলসমূহে মানবপাচারের সম্ভাবনাযুক্ত অপরাধসমূহকে উপেক্ষা করে থাকে। এক বাংলাদেশী নাগরিক তার সাবেক নিয়োগকর্তা, যিনি দূতাবাসের কর্মকর্তা ছিলেন, তার ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে ২০১৪ সালে "ট্রাফিকিং ভিকটিমস প্রটেকশান এ্যক্ট" এর লংঘনসহ অন্যবিধ উপায়ে শোষনের অভিযোগে নিউইয়র্কে মামলা দায়ের করেছিল; মামলাটি চলছে, আর এরমধ্যে উক্ত কর্মকর্তা আরো দুটি কূটনৈতিক পদ অলঙ্কৃত করেছেন। মানবপাচারের অপরাধে সরকারি কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে কোন তদন্ত, বিচার, বা দোষী সাব্যস্ত করার কোন বিবরণ ২০১৫ সালে সরকারের নিকট থেকে দেয়া হয়নি।

সুরক্ষাপ্রদান

মানবপাচারের ভুক্তভোগীদের সুরক্ষাপ্রদানে সরকারি প্রয়াসে অধোগতি প্রকাশ পেয়েছে। মানবপাচারের ভুক্তভোগীদের সণাক্তকরণে প্রণোদিত হয়ে কাজ করার জন্য কর্মপরিচালনার প্রমিত বিধিবিধান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে আছে; তবে সেটা কতটুকু প্রচারিত হয়েছে বা ব্যবহৃত হয়েছে তা সুস্পষ্ট নয়। সরকার ২০১৫ সালে ১৮১৫ জন ভুক্তভোগীকে সণাক্তকরার কথা বলেছে; সণাক্তকৃতদের মধ্যে ১৩১০ জন নারী, ও ১৯০ জন শিশু। এটা ২০১৪ সালে সণাক্তকৃত ২৮৯৯ জন ভুক্তভোগীর সংখ্যার চেয়ে বেশ কম; বিশেষজ্ঞরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, এই হ্রাস অংশতঃ মানবপাচারের সংজ্ঞার অধিকতর সঠিক প্রয়োগের কারণে হতে পারে। ২০১৫ সালে সণাক্তকৃত ১৮১৫ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে পুলিশ ১৩০৬ জনকে উদ্ধার করে। এর বাইরে, বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগরের সংকট নিরসনের অংশ হিসাবে সরকার আনুমানিক ২৭০০ জনকে পুনর্বাসিত করেছে বলে জানিয়েছে, যাদের মধ্যে অল্পকিছু সংখ্যক মানবপাচারের ভুক্তভোগী হতে পারে। মানবপাচারের ভুক্তভোগীদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত সহায়ক পরিসেবাদি সরকার প্রদান করেনি, তবে শিশু ও নারী ভুক্তভোগীরা সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত নয়টি বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র, প্রবেশকেন্দ্র, ও নিরাপদ আশ্রমের মাধ্যমে এইসকল সহায়ক পরিসেবা গ্রহন করতে পারত। বয়স্ক পুরুষ ভুক্তভোগীরা এইসকল পরিসেবায় যেতে পারেনা; এনজিওরা পুরুষ ভুক্তভোগীদের কিছু পরিসেবা প্রদান করেছে। ভুক্তভোগীদের শুশ্রুষার জন্য পাঠানোর বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সরকারি নিয়মপদ্ধতির ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে। ২০১৫ সালে সরকার অজ্ঞাতসংখ্যক ভুক্তভোগীদের সরকার-পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই দেয়, তূলনামূলকভাবে, ২০১৪ সালে সণাক্তকৃত ২৮৯৯ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে নয়জনকে সরকার পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রে ঠাঁই দেয়া হয়েছিল। মানবপাচারের ভুক্তভোগীদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিকল্পিত সহায়ক পরিসেবাদি এনজিওসমূহ প্রদান করেছে; পুলিশ অস্থায়ীভিত্তিতে এইসকল ভুক্তভোগীদেরকে এহেন পরিসেবার জন্য পাঠিয়েছিল। অত্যাচারী নিয়োগকর্তাদের নিকট থেকে পালিয়ে আসা নারী কর্মীদের জন্য সরকার রিয়াদের দূতাবাসে ও জেদ্দার কনস্যুলেটে আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা করা অব্যাহত রেখেছে; তবে, সার্বিক বিবেচনায়, গন্তব্যদেশে কর্মকর্তাদের কাছে শ্রমপাচারের ভুক্তভোগীদের পর্যাপ্ত সহায়তা দেয়ার মত পরিসম্পদের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশী অভিবাসী কর্মীদের মধ্যে যারা আদিতে জনশক্তি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যূরোর (বিএমইটি) মাধ্যমে নিয়োগলাভ করেছিল, তারা দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর বিএমইটি-র নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারত, এবং জবরদস্তিমূলক শ্রমসহ শ্রম ও রিক্রুটমেন্ট সম্পর্কিত লংঘনের অভিযোগ সম্পর্কে সরকারি সালিসের আবেদন করতে পারত। এনজিওরা জানিয়েছে যে, এহেন প্রতিকারলাভের সুযোগ সম্পর্কে সকল

ভুক্তভোগীরা অবগত নয়। সালিসি প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্তদের উপসম দিয়েছে বটে, তবে প্রাপ্তির পরিমান ছিল প্রায়শই ন্যূনতম এবং তাতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিক্রুটমেন্ট এজেন্সীর জালিয়াতির অভিযোগসহ অবৈধ কর্মকান্ডের সুরাহা পর্যাপ্তরূপে করা হয়নি।

মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে মামলার বিচারকালে পুলিশী নিরাপত্তা এবং ভিডিওযোগে স্বাক্ষ্য প্রদানের সুযোগসহ ক্ষতিগ্রস্থদের সুরক্ষা দেয়ার বিধান আছে, তবে কর্মকর্তারা এই ধরণের সুরক্ষা কতটা প্রদান করেছেন তা সুস্পষ্ট নয়। এনজিওরা লক্ষ্য করেছে যে, অপর্যাপ্ত সুরক্ষার ফলশ্রুতিতে তদন্ত ও মামলা পরিচালনার হার সার্বিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত সরকার শিশুপাচারের ভুক্তভোগীদের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রমিত কর্মপরিচালনা পদ্ধতির আওতায় উদ্ধার ও পুনর্বাসনকাজ সমন্বয় করেছে; তবে, মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে বিদেশী ভুক্তভোগীদের এমন কোন দেশে, যেখানে তারা দূর্ভোগ বা প্রতিশোধমূলক শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে, সেখানে অপসারণ না করার বিষয়ে কোন আইনি বিকল্প রাখা হয়নি। পাচারসম্ভব ভুক্তভোগীসহ অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বৈধ কাগজপত্রের অভাবে অনির্ধারিত কালের জন্য আটক থাকার ঝুঁকিতে পড়ার আশংকা থাকতে পারে।

প্রতিরোধ

মানবপাচার প্রতিরোধকল্পে সরকার সীমিত আকারের প্রচেষ্টা দেখিয়েছে। সরকার বায়রাকে অত্যন্ত উচ্চহারে রিক্রুটমেন্ট ফিস আদায়ের অনুমতি প্রদান অব্যাহত রেখেছে, সেটা বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের ঋণদাসে পরিণত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারে। ২০১৪ সালে বিএমইটি ৪টি রিক্রুটমেন্ট এজেন্সীর লাইসেন্স বাতিল করার বিপরীতে ২০১৫ সালে কোন লাইসেন্স বাতিল করেনি। একটি বিদেশী সরকারের প্রদত্ত সহায়তার মাধ্যমে ২৯জন ভুক্তভোগী ২০১৫ সালে ঢাকাভিত্তিক কয়েকটি রিক্রুটমেন্ট এজেন্সীর বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। পূর্ববর্তী প্রতিবেদনকাল হতে সৌদি আরবের সাথে সম্পাদিত একটি শ্রমিক রপ্তানি চুক্তির প্রয়োগ সরকার অব্যাহত রেখেছে যেখানে বিধান রয়েছে যে, নিয়োগকারীকে বিমানভাড়াসহ ভ্রমন খরচ এবং ডাক্তারি পরীক্ষার খরচ বহন করতে হবে, আর নারী শ্রমিকদের নিয়োগ হবে যে ব্যক্তিমালিকানধীন গৃহস্থবাড়ীতে সে নারী কাজ করবে তার পরিবর্তে তৃতীয় কোন পক্ষ কর্তৃক; তবে সরকার খরচের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেয়নি কিংবা বিদেশগামীদের নিকট থেকে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সী কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণ মাশুল আদায় ব্যবস্থাও বাতিল করেনি। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MEWOE) এর "নজরদারি টাস্কফোর্স" বাংলাদেশের শ্রম নিয়োগ প্রক্রিয়ায় উন্নতি সাধনের ম্যান্ডেট নিয়ে তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সরকার সরকারি পর্যায়ে মালয়েশিয়ায় ১৫ লক্ষ বাংলাদেশী কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার উদ্দেশ্য ছিল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সীসমূহের উচ্চহারে ফিস আদায়ের এবং কখনো কখনো অসাধু কর্মকান্ডের প্রভাব লাঘব করা; তবে, তাতে যে সকল মালয়েশিয় কোম্পানি বিদেশী কর্মী নিয়োগ করবে তাদের প্রদেয় মাশুল বাড়িয়ে দেয়া হয়; তাতে পর্যবেক্ষকদের আশংকা হয় যে নিয়োগকারীরা প্রতারণামূলকভাবে এই ফিসকে কর্মীদের উপর আরোপ করবে, আর তাতে তাদের ঋণদাসে পরিণত হওয়ার শংকা বৃদ্ধি পাবে। তদুপরি, এই চুক্তি স্বাক্ষরের স্বল্পসময়ের মধ্যেই মালয়েশিয়া নতুন করে বিদেশী কর্মী নিয়োগ নিষিদ্ধ করে; প্রতিবেদনকালের শেষঅব্দি সেই

নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল, তাতে কার্যতঃ চুক্তিটি বাতিল হয়ে পড়েছে। গার্হস্থ্যকর্মী হিসাবে বাংলাদেশি নারীদের বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার পূর্বে একটি ২১দিনের প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ কোর্সের বাধ্যবাধকতা সরকার অব্যাহত রেখেছে; এই প্রশিক্ষণে হাতেকলমে নানাবিধ দক্ষতা, যেমন গৃহস্থালীর সরঞ্জামাদির ব্যবহার, শেখার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়, তবে তাতে পাচার সংক্রান্ত সচেতনতা বিষয়ক এবং আত্মরক্ষার শিক্ষাক্রমও অন্তর্ভুক্ত আছে।

সরকার ও এনজিওদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয়ের বিধান রেখে সরকার ২০১৫ সালের জুনমাসে ২০১৫-১৭ মেয়াদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে এবং তা চালু করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মানবপাচারের উপর তার ২০১৫ সালের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় জাতীয় পর্যায়ে এবং উচ্চঝুঁকিসম্পন্ন এলাকায় পোস্টার এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমেসহ কিছু পাচারবিরোধী সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান পরিচালনা করেছে। কক্সবাজারে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচারের সুবিধাকে কাজে লাগিয়েছিল, আর আন্দামান সাগরের অভিবাসন সংকটের মোকাবেলায় মানবপাচার সম্পর্কে সর্বসাধারণ ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে অনেকগুলো কর্মশালার আয়োজন করেছিল। সরকার সামরিক কর্মকর্তাদের

সরকার আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশনে বিদেশে পদায়নের পূর্বে মানবপাচার চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করার নিমিত্ত সামরিক ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে এবং তার কূটনৈতিক কর্মচারীদের জন্য পাচারবিরোধী প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। বাণিজ্যিক যৌনতার বা জবরদস্তিমূলক শ্রমের চাহিদা কমাতে সরকার প্রচেষ্টা দেখায়নি। বাংলাদেশ জাতিসংঘের টিআইপি প্রটোকল ২০০০-এর পক্ষভুক্ত দেশ নয়।